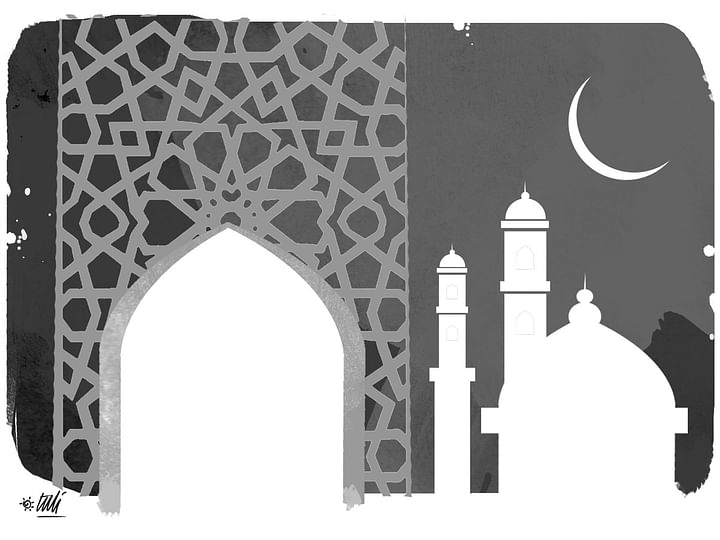
**ভাষার শুদ্ধ লিখন–পঠন সুন্নাত ও ইবাদত**



ধর্ম

ভাষার বৈচিত্র্য আল্লাহর দান ও তাঁর কুদরতের নিদর্শন। কোরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।’ (সুরা-৩০ রুম, আয়াত: ২২)। মানুষের পরিচয় বা সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ‘হায়ওয়ানুন নাতিক’ অর্থাৎ ‘বাক্‌শক্তিসম্পন্ন প্রাণী’। আপাতদৃষ্টে মানুষ ও প্রাণী তথা পশুর মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য হলো বাক্‌ বা ভাষা। কোরআন কারিমের বর্ণনা, ‘দয়াময় রহমান আল্লাহ! কোরআন পাঠ শেখালেন; মনুষ্য সৃজন করলেন; তাকে ভাষা বয়ান শেখালেন।’ (সুরা-৫৫ আর রহমান, আয়াত: ১-৪)।

মহান আল্লাহ কিতাব নাজিল করেছেন ও নবী–রাসুলদের পাঠিয়েছেন তাঁদের স্বজাতির ভাষায়। কোরআন মজিদে এসেছে, ‘আমি প্রত্যেক রাসুলকেই তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য।’ (সুরা-১৪ ইবরাহিম, আয়াত: ৪)।

কোরআন কারিম আরবি ভাষায় নাজিল করার কারণ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং ব্যাখ্যা প্রদান করেন এভাবে, ‘এই কোরআন আমি অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।’ (সুরা-১২ ইউসুফ, আয়াত: ২)। অর্থাৎ আরবদের কাছে আরবি নবী ও আরবি কিতাব আল–কোরআন নাজিল করা হয়েছে, কারণ তাঁদের মাতৃভাষা আরবি, যাতে বুঝতে এবং অনুসরণ করতে সহজ হয়।

দাওয়াতি কাজে শুদ্ধ ভাষা ও সুন্দর বর্ণনার প্রভাব অনস্বীকার্য। আমাদের প্রিয় রাসুল (সা.) ছিলেন ‘আফছাহুল আরব’ তথা আরবের শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ ভাষী। তাই বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় কথা বলা নবীজি (সা.)–এর অন্যতম সুন্নাত ও ব্যক্তিত্বের নিদর্শন।

কোরআন নাজিলের আগে আরবদের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যচর্চার স্বর্ণযুগ ছিল। কোরআন মুজিজা হিসেবে আরবি ভাষা-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা হিসেবে নাজিল হলো, যা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ আরবি ভাষায় মানোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ। পাশাপাশি নবীজি (সা.) হাদিস তথা বাণীসমূহ কোরআনের পরই শ্রেষ্ঠ আরবির নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত। কোরআন ও হাদিসে শব্দ চয়ন ও শব্দের যথাযথ ব্যবহার এবং বাক্যের সঠিক বিন্যাস ও যথাযথ প্রয়োগের এবং বলা ও শোনার পদ্ধতি বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা বিদ্যমান। (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১০৪; সুরা-২০ ত্ব-হা, আয়াত: ৪৪)।

আল্লাহ তাআলা হজরত মুসা (আ.)–কে নবী ও রাসুল হিসেবে ঘোষণা করলেন; তখন তিনি তাঁর ভাই হজরত হারুন (আ.)–কে রাসুল হিসেবে ঘোষণা করার জন্য আল্লাহর সমীপে আবেদন করেন। ‘আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে বাগ্মী, অতএব তাকে আমার সাহায্যকারী রূপে (রাসুল হিসেবে) প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশঙ্কা করি তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। (আল্লাহ বললেন) আমি তোমার ভ্রাতাদ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করব এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য প্রদান করব। তারা তোমাদের নিকট পৌঁছাতে পারবে না, তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে তাদের ওপর বিজয়ী হবে।’ (সুরা-২৮ কছাছ, আয়াত: ৩৪-৩৫; সুরা-২০ ত্ব-হা, আয়াত: ২৫-৩৮)।

ভাষা হলো ভাব প্রকাশের মাধ্যম। ভাষার অলংকৃত রূপ হলো সাহিত্য। সাহিত্যের বিশেষায়িত পর্ব হলো কবিতা বা ‘শেয়ের’। যিনি কাব্য করেন তিনি হলেন ‘শায়ের’। আরবি ভাষার ব্যাকরণ মুসলমানদের হাতেই রচিত হয়। অনারবদের কোরআন পড়তে সমস্যা হতো বিধায় হজরত আলী (রা.) তাঁর প্রিয় শিষ্য হজরত আবুল আসওয়াদ দুওয়াইলি (রহ.)–কে নির্দেশনা দিয়ে আরবি ভাষাশাস্ত্র প্রণয়ন করান, যা ইলমে নাহু (বাক্যবিন্যাস) ও ইলমে ছরফ (শব্দ প্রকরণ) নামে পরিচিত। মুসলমানদের হাতেই উচ্চতর আরবি-ভাষাতত্ত্ব ও অলংকার শাস্ত্র তথা ইলমে বায়ান, ইলমে মাআনি ও ইলমে বাদির উন্নয়ন ঘটে। প্রায় সব মুসলিম মনীষী একাধিক ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন এবং সাহিত্য ও কাব্যচর্চা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘(হে নবী! সা.) আমি আপনার প্রতি সর্বসুন্দর কাহিনি বর্ণনা করেছি।’ (সুরা-১২ ইউসুফ, আয়াত: ২)। প্রিয় নবী (সা.) নিজে কাব্য পছন্দ করতেন। বিখ্যাত সাহাবি হজরত হাসসান ইবনে সাবিত (রা.) কাব্য রচনা করতেন। হজরত আয়শা (রা.) কাব্য চর্চা করতেন। ইসলামের সব যুগেই বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্যচর্চা চলে আসছে। (তাফসিরে ইবনে কাসির)।

ভাষাশিক্ষা, লিখন ও পঠনশিক্ষাকে ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বদর যুদ্ধের শিক্ষিত বন্দীদের মুক্তিপণ হিসেবে ১০ জন মুসলিমকে লিপি ও পাঠ শেখানোর বিনিময়ে মুক্তি দান করা হয়েছিল। মাতৃভাষার পাশাপাশি প্রয়োজনে বিদেশি ভাষাও শিখতে হবে এবং তা–ও শুদ্ধ হতে হবে। মহানবী (সা.) সাহাবিদের বিদেশি ভাষা শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন।collected..